সামনে কী আছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

আমার ছোট মেয়েটি যখন খুব ছোট ছিল, তখন জগৎ কে সে দু'টুকরোয় ভাগ করে দেখত- সাদা ও কালো, ভালো ও মন্দ। মাঝখানে যে সাদায়-কালোয় মিশ্রিত একটি ধূসর এলাকা রয়েছে, সেই সত্যটাকে সে মানতেই চাইত না। কোনো গল্প শুনলে কিংবা টেলিভিশনে কোনো ছবি দেখলে মাকে জিজ্ঞাসা করত লোকটা ভালো নাকি মন্দ। ভালো শুনলে নিশ্চিত হতো। আমরাও কিন্তু তাই হই। সব বয়সের মানুষই আসলে ভালোর খবর শুনলে সুখী হয়। কিন্তু সে খবরটা তো পাওয়া যায় না। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলো যে মধুময় হবে-এমনটা ভরসা করবার কোনো কারণ নেই। কেননা, দেশে অভাব বাড়ছে, খাদ্যের আক্রা দেখা দিয়েছে, জনসংখ্যা ক্রমর্বধমান, প্রকৃতি বিরূপ। এর মধ্যে সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে আশাবাদি হব কোন ভরসায়! হয়তো যেমন আছে তেমনই থাকবে, যার র্অথ দাঁড়াবে অবস্থা আরো খারাপ হবে। বড় প্রশ্নটা হলো, আমরা কি সেই নিয়মটাকে মেনে নেব, নাকি চেষ্টা করব অবস্থাটাকে বদলাতে। আগামী দিনে সমাজ ও সংস্কৃতির চেহারাটা কী দাঁড়াবে তার অনেকটাই র্নিভর করছে সমাজ নিয়ে চিন্তিত ও সংস্কৃতিসচেতন মানুষের। কোন অবস্থান নেন তার ওপর। আত্মসর্মপণ করি নাকি প্রতিরোধ গড়ে তুলি, সেটা দিয়েই অনেকাংশে ঠিক হবে সমাজ এবং সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ও।

বিশ্বব্যাপী র্অথনৈতিক মন্দা চলছে। আমাদের দেশে বিদ্যমান মন্দাদশা যে এই বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একথা সকলেই বলছেন এবং মোটেই মিথ্যা কথা বলছেন না। এমন সরাসরি যোগাযোগটা অবশ্য আগের দিনে ছিল না, তখন বিশ্বকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে ভাগ করা হতো এবং আমরা ছিলাম তিন নম্বরটিতে; এখন সকল বিশ্ব একাকার ও এক হয়ে গেছে, সবটাই পরিণত হয়েছে পুঁজিবাদী বিশ্বে।

পুঁজিবাদের নিয়ম এটাই যে, একদিকে সে কিছু মানুষের জন্য প্রাচুর্য সৃষ্টি করবে এবং ঠিক তার বিপরীতে অধিকাংশ মানুষকে ঠেলে দিবে অভাবের নিরুপায় জগতে। যেমন আমাদের দেশের মানুষকে দিয়েছে। পুঁজিবাদের র্বতমান কার্যকলাপ যে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার প্রমাণ খুঁজতে বেশি দূর যাবার দরকার পড়ে না। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকটের অনিরাপদ দৃশ্যের দিকে তাকালেই পরিষ্কাররূপে ফুটে ওঠে। ধনী দেশগুলো জৈব জ্বালানি পুড়িয়ে প্রকৃতিকে বিরূপ করেছে, বন্যা ও খরা দুটোই দেখা দিয়েছে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন বাড়ছে না। তদুপরি, জৈব জ্বালানির বিকল্প হিসাবে খাদ্যশস্য পুড়িয়ে গ্যাস তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। পুঁজিবাদের এটাই হচ্ছে স্বভাব প্রকৃতিকে উত্যক্ত করে সে খাদ্যের উৎপাদন কমায়, আবার প্রকৃতিকে শান্ত করবার জন্য খাদ্যশস্যকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে; পন্থা ভিন্ন, কাজ এক-কাজটা হলো মানুষ মারা।

পুঁজিবাদের অধীনে সবকিছুরই চালিকাশক্তি এক ও অভিন্ন- সেটা হচ্ছে
মুনাফা। আর মুনাফা মানেই হচ্ছে নিজের লাভ। নিজে লাভ করতে হলে অন্য সবাইকে বঞ্চিত করতে হবে, ওটাই নিয়ম। এই নিয়মে সমাজ চলে না; সংস্কৃতি বিকশিত হয় না। কেননা সমাজের যেমন সংস্কৃতিরও তেমনি প্রাণকেন্দ্রটি অন্য কিছু নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, পারস্পরিক সহযোগিতা, আদান-প্রদান ভিন্ন। সমাজ ও সংস্কৃতি ছাড়া মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় না, বরঞ্চ পঙ্গু ও খণ্ডিত হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা আজ বিশ্বব্যাপী ঘটছে, বাদ নেই বাংলাদেশেও।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে যখন শুরুই করেছি, তখন আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করি। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। নাম ছিল 'স্বাতন্ত্র্যের দায়'। সেখানে প্রতিপাদ্যটি ছিল এই রকমের যে, আমাদের লেখা প্রবন্ধগুলো ভীষণভাবে সামন্তবাদী র্দুদশার দ্বারা আক্রান্ত, সেখানে প্রকাশের বৈচিত্র্যে বড় অল্প, যার দরুন একজনের রচনাকে অপরাপরের লেখা থেকে আলাদা করতে গেলে কষ্ট হয়; অথচ লেখক মাত্রেরই দায়টা হচ্ছে ¯^Zš¿ হওয়া। সেকালে ¯^vZš¿¨ বলতে আমরা বুঝতাম আধুনিকতা; আধুনিক মানুষ প্রত্যেকেই অপর সকলের থেকে ভিন্ন, আর সেখানেই রয়েছে ব্যক্তির আধুনিকতা, ভাবনাটা ছিল এই

রকমের। আমরা সামন্তবাদের বৃত্ত ভেঙে বের হব বলে আশা করতাম, জানতাম না যে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে পুঁজিবাদের
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, যেখানে আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। আমরা সংযোগ হারাব কেবল আপনজনদের সঙ্গে নয়; প্রকৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য এমনকি নিজের সঙ্গেও। আসলে এটাই তো ঘটেছে। আমরা খেয়াল করি না, ভেতরে-বাইরে মুনাফালোলুপতা ক্রমাগত অতি উগ্র হয়ে পড়ছে।

আর এই যে মুনাফার পেছনে এবং
মুনাফার দ্বারা নিত্য ধাবমান থাকা, এর ফলে সামাজিকতা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে, সংস্কৃতি পড়ছে কৃত্রিম হয়ে। বিপন্ন হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

পুঁজিবাদের আরও একটি অনিবার্য অবদান হচ্ছে বৈষম্য বৃদ্ধি। প্রধান বৈষম্যটা অবশ্যই ধনী ও দরিদ্রের। তার বাইরেও বহু ধরনের অসাম্য তৈরি হয়। গ্রামে ও শহরে পার্থক্য ঘটে। বৈষম্য দেখা যায় পুরুষ ও নারীতে। পরিবারের ভিতরে অসাম্য চলে আসে। ভাই দূরে সরে যায় ভাই থেকে, বোন শত্রু হয়ে যায় বোনের, ¯^vgx-¯¿xi সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। আমাদের সমাজে এসব বৈষম্য অবশ্য আগেও ছিল, তবে এখন অনেক অনেক বেড়েছে। একেই আমরা ভাবছি আধুনিকতা ও উন্নতি।

এই যে আমাদের নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ; এখানে মানুষ মানুষে বৈষম্য থাকবে না, বিচ্ছিন্নতা দূর হবে, আমরা পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে সহযোগী ও মিত্র হব- এটাই ছিল ¯^cœ| কিন্তু তা ঘটেনি। বরঞ্চ উল্টোটাই ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। বৈষম্য সৃষ্টির একটা জাজ্বল্যমান ভিত্তি ছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, যে জাতীয়তাবাদ এক সমপ্রদায়কে ওপরে তুলে অন্যদের দাবিয়ে রাখতে চাইত। সে জায়গায় আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম ধর্মনিরপেক্ষতাকে; কিন্তু সংবিধানে তো তাকে ধরে রাখতে পারিনি, রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা পেয়ে একদল লোক সংবিধানের মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একেবারে উ□পাটিত করে তবেই ছেড়েছে। একাত্তরে ওটা অকল্পনীয় ছিল যে, ¯^vaxb বাংলাদেশে ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করার সুযোগ দেখা দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ী ও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীরা কেবল যে প্রকাশ্যে রাজনীতি করে বেড়াচ্ছে তা-ই নয়, তারা রাষ্ট্রক্ষমতারও অংশীদার হয়ে বসেছে। পাকিস্তানের কালে মুসলিম লীগ ধর্মের নামে জনসমর্থন আদায় করতে চাইত, পূর্ববঙ্গের মানুষ সে রাজনীতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন বাংলাদেশের আমলে দেখা যাচ্ছে কেবল যে নতুন ধর্মব্যবসায়ীরা তা নয়, সাবেক যুদ্ধাপরাধীরাও রাজনীতিতে ত□পর রয়েছে। তারা নানা অজুহাত তৈরি করে নিজেদেরকে ক্ষমতাবান করতে চায়। কাদিয়ানী উ□খাত, নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির বিরুদ্ধে জেহাদ, তসলিমা নাসরিনের শিরচ্ছেদ, আহমদ শরীফকে মুরতাদ ঘোষণা, মেয়েদের খেলাধুলা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি যখন যে ইস্যু তৈরি করা যায় তখন সেটা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ যে ভূমিকা নিয়েছিল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে বিএনপির ভূমিকা তা থেকে যে খুব দূরের তা নয়। কিন্তু সেকালে তো আওয়ামী লীগ ছিল, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চার মধ্য দিয়ে অসামান্য জনসমর্থন লাভ করেছিল, যাদের জয় বাংলা ধ্বনিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে লড়াইতে পূর্ববঙ্গবাসী উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্ন্তভুক্তিবাদের উদ্যোগ ঘটেছিল, একালে তারাও দেখা গেল ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী তো নয়ই, বরঞ্চ ভোট সংগ্রহের রাজনীতিতে অবর্তীণ হয়ে তারাও নব্য মুসলিম লীগপন্থী বিএনপির মতোই ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে অসম্মত হলো না। ফলে প্রধান দুই দলের কোনোটির কাছ থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সর্মথন পাওয়া গেল না। এ প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা; কেননা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ই ঘটেছে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে, যার র্অথ হলো এই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি স্থাপন ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে ঘটেনি।

এটা লক্ষ করবার বিষয় যে, রাজনীতিতে ধর্মের দৌরাত্ম্য এখন যতটা দেখা যাচ্ছে,

পাকিস্তান আমলেও ততটা দেখা যায়নি। সেকালে ইসলামী জঙ্গি ত□পরতা ছিল অকল্পনীয়, একালে সেটা বাস্তবিক সত্য। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মাদ্রাসাশিক্ষাকে এখন যেভাবে উ□সাহিত করা হচ্ছে, আমাদের ইতিহাসে কোনোকালেই তেমনটা ঘটেনি।

আমরা সমাজ ও সংস্কৃতির কথা নিয়ে ভাবছি; এরা কিন্তু পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা রাজনীতিনিরপেক্ষ নয়। সংস্কৃতি সমাজের ওপর ভর করে চলে, আবার সমাজই হলো সংস্কৃতির র্কমক্ষেত্র। অন্যদিকে রাষ্ট্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে; আগে করেছে, দুই-দুবার ¯^vaxb হবার পরও সেই কাজ সমানে করে চলেছে। আর আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্য□ নিয়ে যদি চিন্তা করতে বসি তাহলে মানতেই হবে আমাদের সমাজের যা সমস্যা, সংস্কৃতিরও সেই একই সমস্যা- মূলত বিচ্ছিন্নতা এবং বৈষম্য। এবং এই দুটিই এসেছে পুঁজিবাদী র্অথনৈতিক ও আদর্শিক ব্যবস্থা থেকে। পুঁজিবাদই হচ্ছে আসল শত্রু; সমগ্র বিশ্বের এবং অবশ্যই আমাদের। এই সত্যটা উদারনীতিকেরা বুঝতে চান না; পুঁজিবাদীরা তো বুঝবেনই না। এমনকি বামপন্থীদের সকলেই যে সমানভাবে অনুধাবন করেন তা মনে হয় না।

সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্য□টা তাই আমরা কী করি তার ওপরই অংশত র্নিভর করছে। অংশত বললাম এই বাস্তবিক কারণে যে পুঁজিবাদ তো তার কাজ করেই যাবে, র্অথা□ শত্রুতা করবে সমাজ-সংস্কৃতির মানবিক তথা গণতান্ত্রিক বিকাশের পথে। আমরা যারা ঘটনাটি নিয়ে চিন্তিত, তাদের দায়িত্ব পুঁজিবাদী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। অবস্থান নিতে গেলে প্রথমেই এবং সব্র্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যে কাজটি করা চাই তা হলো মাতৃভাষার র্চচা। ব্যাপারটাকে এমনিতে মোটেই সামান্য ও সহজ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে সেটা সামান্য নয় এবং র্বতমান পরিস্থিতিতে মোটেই সহজ নয়। যদিও কে না বলবে যে কাজটা অত্যন্ত ¯^vfvweK, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যে দেশের ¯^vaxbZvi প্রতিষ্ঠাই ঘটেছে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে।

মাতৃভাষার র্চচা আমাদেরকে র্ধমনিরপেক্ষ করবে, তিন তিনটি ভিন্ন ভাষায় শিক্ষার অনুশীলন করবার বিভেদপন্থী ও বিপজ্জনক অপচয়ের হাত থেকে আমাদেরকে অব্যাহতি দেবে, মেধা বিকাশের সুযোগকে প্রসারিত করবে এবং বিচ্ছিন্নতার জায়গায় ঐক্য নিয়ে আসবে। মাতৃভাষার র্চচা করে আমরা দেশপ্রেমিক হব এবং সারা বিশ্বের র্অজনসমূহ গ্রহণ করার ভেতর দিয়ে একই সঙ্গে আর্ন্তজাতিক হয়ে উঠব। আমাদের সমাজে যে বৈষম্য রয়েছে তা কমে আসবে। মাতৃভাষার র্চচার র্অথ ইহজাগতিক হওয়া এবং ইহজাগতিক হলে তবেই আমরা আশা করতে পাবে যে তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিবাদের হাত থেকে আমরা বাঁচব এবং আমাদের সংবিধানে ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে র্ধমনিরপেক্ষতা তার প্রাপ্য জায়গা খুঁজে নিতে পারবে। সমাজ ও সংস্কৃতি মোটেই আকাশচারী নয়, তার অবস্থান শক্ত র্আথ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতায়। সেই বাস্তবতায় পরির্বতন আনা চাই। তার জন্য বুঝতে হবে যে শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। তার বিরুদ্ধে লড়াটা সহজ নয়। কেননা সে রয়েছে বিশ্ববিজয়ীরূপে বিরাজমান; আছে সে দেশের ভেতরে, রয়েছে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং মানসিকতার মধ্যেও। মাতৃভাষায় যে র্চচার কথা বলছি, সে কাজটা তাই কঠিন। কেননা এটা করতে হলে দাঁড়াতে হবে ভয়ঙ্কর ওই শত্রুর বিরুদ্ধে। কাজটা মূলত রাজনৈতিক, যদিও একে সাংস্কৃতিক বলে মনে হতে পারে। রাষ্ট্র পুঁজিবাদের আজ্ঞাবহ হয়ে পড়েছে এবং যতই ভান করুক না কেন এই রাষ্ট্র মাতৃভাষার র্চচার পক্ষে নয়।

দাঁড়ানো চাই এক সাথে। একাত্তরের যুদ্ধ পর্যন্ত আমরা যেভাবে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনকার ঐক্যের ভেতর পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় উপাদানই কার্যকর ছিল। মধ্যবিত্ত চেয়েছে ঐক্যের মধ্য দিয়ে নিজেরা ধনী হবে; তাই তারা ঐক্যের পক্ষে কাজ করেছে; আর সাধারণ মানুষ ¯^cœ দেখেছে লড়াইটা তাদেরকে মুক্ত করে দেবে দারিদ্র্য ও শোষণ থেকে, যে জন্য তারা মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের কাছ থেকে আসা ঐক্যের ডাকে সাড়া দিয়েছে। যুদ্ধের পরে র্কতৃত্ব পেয়ে গেছে পুঁজিবাদী উপাদান, পিছু হটে গেছে সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা। মাতৃভাষার র্চচা ওই আকাঙ্ক্ষাকেই পুনরুজ্জীবিত করবে।

মূল লড়াইটা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি থাকবে, অর্থাৎ হবে তা রাজনৈতিক। কিন্তু তার লক্ষ্য থাকবে কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা নয়; লক্ষ্য হবে সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন নিয়ে আসা, যে পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনকে ধরে রাখবে এবং সংস্কৃতিকেও মানবিক করে তুলবে। এই লড়াইতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকে অবশ্যই যুক্ত করা দরকার হবে। এর মধ্য দিয়ে আমরা যা অর্জন করব তা আমাদের সামাজিক ও ¯^vfvweK করে তুলবে এবং তা গচ্ছিত থাকবে সংস্কৃতিতে, গুদামজাত অবস্থায় নয়, জাদুঘরে প্রদর্শনীর আকারেও নয়, জীবন্ত ও বিকাশোন্মুখরূপে।

ভালো ফল চাইলে ভালোর পক্ষে দাঁড়াতে হবে, একা নয় মিলিতভাবে, কেবল দেশে নয় আর্ন্তজাতিক পর্য্যায়েও।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : লেখক, শিৰাবিদ